অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবনোপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন।[১] আল্লাহ তাআলার অশেষ করুণা বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৌলিক সকল বিষয়ে দিক্‌নির্দেশনা প্রদানের অংশ হিসেবে, জীবন-জীবিকার আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ পথনির্দেশনা দিয়েছেন! করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সকল সাহাবি ﷺ ও তাঁদের অনুসারীদের উপর!

জীবিকা হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম বড় পার্থক্য—স্রষ্টা জীবিকার ঊর্ধ্বে, অন্যদিকে সৃষ্টিমাত্রই জীবিকার মুখাপেক্ষী। তাই ঈসা ﷺ ও তাঁর মা মারইয়াম ﷺ-কে জড়িয়ে খ্রিষ্টানরা যে ত্রিত্ববাদের (Trinity) ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছে, তা নাকচ করার জন্য কুরআন শুধু এটুকু উল্লেখ করেছে—"তাঁরা উভয়েই খাবার খেতেন।"[২] অর্থাৎ, যে সত্তা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খাবারের মুখাপেক্ষী, সে কিছুতেই স্রষ্টা হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির জীবিকা-দাতা; কিন্তু বিষয়টির মানে এই নয় যে, মানুষ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করে চুপচাপ বসে থাকবে, আর জীবিকা তার সামনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে। বিষয়টির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এসেছে নবি ﷺ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> "তোমরা যদি আল্লাহর উপর সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে, তাহলে তিনি তোমাদের সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের দিয়ে থাকেন: এরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকালবেলা (বাসা থেকে) বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরাপেটে।"[৩]

উপরিউক্ত হাদীসে পাখির কর্মপদ্ধতিকে সঠিক তাওয়াক্কুলের একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে; পাখিরা বাসায় নিষ্কর্মার মতো বসে না থেকে, তার রবের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়ে।

মানুষকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে জিনিসটি, তা হলো জীবিকা-অনুসন্ধান। একদল লোক জীবিকার পেছনে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার কর্মজীবনে বৈধ-অবৈধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ারের

---

[১] দেখুন: সূরা হূদ ১১:৬)

[২] সূরা আল-মাইদাহ্ ৫:৭৫।

[৩] তিরমিযি, ২৩৪৪, হাসান সহীহ।

বেঁচে-থাকা ও তাদের বেঁচে-থাকার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। আর যারা পরকালে নিজেদের রবের সামনে জবাবদিহির কথা স্মরণে রাখে, তাদেরও একটি বিরাট অংশ বৈধ জীবিকার পেছনে এত সময় ব্যয় করে যে, পরকালের পর্যাপ্ত পাথেয় সংগ্রহ করার সময় আর তাদের হয়ে উঠে না।[১] এদের বিপরীতে রয়েছে আরেকটি প্রান্তিক দল, অলসতাই যাদের ধর্ম, কারণে-অকারণে মানুষের কাছে হাত-পাতাই যাদের স্বভাব; আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা বেছে নেয় বৈরাগ্যবাদী নীতি। ঠিক এ ধরনের কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, উমার ﷺ জানতে চান, 'এরা কারা?' বলা হয়, 'এরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী।' তিনি বলেন,

> 'না, এরা কিছুতেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী নয়, এরা বরং বসে-বসে খাওয়ার লোক—এরা মানুষের সম্পদ খাচ্ছে! আমি কি তোমাদের বলব না, প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী কে?'

বলা হয়, 'হ্যাঁ!' তখন তিনি বলেন,

> 'প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হলো ওই ব্যক্তি, যে জমিনে বীজ বপন করার পর তার মহান রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, এরপর তিনি বলেন,

> "ওহে ইবাদাতকারীরা! মাথা ওঠাও এবং নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করো।"[২]

জীবিকা-অনুসন্ধানের ভারসাম্যপূর্ণ পথ কোনটি—অর্থশাস্ত্রের এ মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশনা পাওয়া যায় আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের বিভিন্ন বক্তব্যে। সেসব দিক্‌নির্দেশনার ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে 'আল কাস্‌ব (জীবিকা উপার্জন)' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সময়কাল বিবেচনায় এটিকে ইসলামের ব্যষ্টিক অর্থনীতির (microeconomics) প্রাচীনতম সুগ্রথিত গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থশাস্ত্রের আরেকটি বড় ভাগের নাম হলো সামষ্টিক অর্থনীতি (macroeconomics), যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুগ্রথিত গ্রন্থ রচনা

---

[১] অথচ আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো! আর প্রত্যেকে যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে—সামনের দিনগুলোর জন্য সে অগ্রীম কী কী পাঠিয়েছে। আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো, আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখছেন। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, ফলে তিনি তাদের আত্মভোলা বানিয়ে দেন, (আর) তারাই পাপাচারে লিপ্ত হতে থাকে।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:১৮–১৯)

[২] কান্‌যুল উম্মাল, ৪/১২৯।

করেছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ﵀। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল আমওয়াল'।

জীবিকার পেছনে আমাদের নির্ঘুম নিরন্তর ছুটে চলার মুখে কিছুটা লাগাম পরিয়ে, তাকে পরকালের স্থায়ী জীবনমুখী করার লক্ষ্যে, ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর রচিত 'কিতাবুল কাস্ব' গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **'জীবিকার খোঁজে'**।

গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা শামসুল আইম্মা আবূ বাকর সারাখ্সি ﵀, যিনি তিরিশ খণ্ডে মুদ্রিত 'আল-মাবসূত' নামক আইনের বিশ্বকোষ রচনা করে, আইনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

হাল আমলে এ গ্রন্থটি সিরীয় বিদ্বান আবদুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ ﵀-এর বিস্তৃত টীকা সহ বৈরুতের দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তারও এক যুগ আগে, ১৯৮৬ সালে মাহমুদ আরনূসের টীকা সহ এ গ্রন্থটির একটি সংস্করণ বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে দারুল বাশাইর সংস্করণটিকে মূল হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে। কোথাও পাঠগত সমস্যা দেখা দিলে, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ﵀ এমন এক যুগের বিদ্বান, যে যুগে ইমাম মালিক ﵀-এর 'আল-মুওয়াত্তা' ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অন্য কোনও হাদীসগ্রন্থ গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ শুরুই হয়নি; তাই ওই যুগে রচিত গ্রন্থাবলির একটি সাধারণ রীতি হলো—সেখানে কোনও হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকে না, এর পরিবর্তে থাকে লেখকের নিজস্ব সনদ, আবার কখনও কখনও সনদ উল্লেখ না করে মূল বক্তব্যটুকুই উল্লেখ করা হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর বিভিন্ন রচনায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব হাদীস পরবর্তী পর্যায়ে রচিত বিশুদ্ধ হাদীস-গ্রন্থাবলিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে—কখনও তা হুবহু শব্দে শব্দে, কখনও কাছাকাছি শব্দ-সমৃদ্ধ, আবার কখনও কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক।

'কিতাবুল কাস্ব' গ্রন্থে যেসব হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হয়েছে, আবূ গুদ্দাহ্ ﵀ পাদটীকায় সেসব হাদীসের উৎস-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থাবলির কোন অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদে সেটি স্থান পেয়েছে,

তা উল্লেখ করার পাশাপাশি হাদীসের মূলপাঠটিও তুলে ধরেছেন। তারপর ওই হাদীসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে হাদীসবিশেষজ্ঞগণ কে কী বলেছেন, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এসব বিস্তৃত তথ্য অনুবাদ-পাঠকদের জন্য জরুরি নয় বিধায়, হাদীসের উৎস-নির্দেশের ক্ষেত্রে কেবল হাদীসগ্রন্থের নাম, হাদীস নং (ক্ষেত্রবিশেষে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং) ও এক-দু' শব্দে হাদীসটির মান উল্লেখ করেছি।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে, দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে, নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়ামাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলি প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে, বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

রবের রহমত-প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী
২১ জুমাদাস সানী, ১৪৪০/ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
jiarht@gmail.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি ﵀ ইসলামি আইনশাস্ত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। জন্ম ১৩২ হিজরিতে (খ্রি. ৭৪৯), বসরা ও কুফার মাঝখানে অবস্থিত ওয়াসিত শহরে। বেড়ে উঠেছেন তৎকালীন ইসলামি জ্ঞান-গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র কুফায়।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মিসআর, মালিক ইবনু মিগ্ওয়াল, উমার ইবনু যার, সুফ্ইয়ান সাওরি, আওযায়ি ও ইবনু জুরাইজ ﵃ সহ সমকালীন বহু বিদ্বানের কাছে তিনি হাদীস ও আইনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। মুওয়াত্তা-প্রণেতা ইমাম মালিক ﵀-এর কাছে তিনি তিন বছর হাদীস অধ্যয়ন করেন।

গভীর অধ্যবসায়ী এ বিদ্বান জ্ঞান-গবেষণায় কতটা নিবিড় ছিলেন, তা ফুটে উঠেছে তার মেয়ের বর্ণনায়:

> 'তার চারপাশে থাকত বই আর বই। (পড়ার সময়) আমি তাকে কখনও কথা বলতে শুনিনি, কেবল দেখতাম চোখের পাতা বা আঙুলের ইশারায় দিক্নির্দেশনা দিচ্ছেন।'

তিনি রাতকে তিনটি অংশে ভাগ করতেন: একাংশে ঘুম, আরেক অংশে সালাত আদায় আর অপর অংশে পড়াশোনা করতেন। কখনও কখনও তিনি রাতে খুবই কম ঘুমাতেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি ঘুমান না কেন?' জবাবে তিনি বলেন,

> 'আমাদের উপর ভরসা করে মুসলিমদের চোখগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে; আমি ঘুমাই কীভাবে!?'

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি গায়ের জামা খুলে রাখেন কেন?' তিনি বলেন,

> 'উষ্ণতা পেলে ঘুম চলে আসে, আর উষ্ণতার উৎস হলো জামা। (তাই এটি খুলে রাখি।) এরপরও ঘুম চলে আসলে, গায়ে পানি ঢেলে দিই!'

জ্ঞানসাধনার পেছনে তিনি কীভাবে অর্থসম্পদ ব্যয় করেছেন, তা তাঁর নিচের কথা থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়:

> 'আমার পিতা মারা যাওয়ার সময় তিরিশ হাজার দিরহাম রেখে যান। সেখান থেকে আমি পনেরো হাজার দিরহাম খরচ করেছি ব্যাকরণ ও কবিতার পেছনে, আর (বাকি) পনেরো হাজার হাদীস ও আইনশাস্ত্রের পেছনে।'

আল্লাহ-প্রদত্ত অসাধারণ মেধাশক্তি, কঠিন অধ্যবসায়, তীব্র জ্ঞানানুরাগ

ও জ্ঞানসাধনায় প্রচুর অর্থ খরচ—এসবের সমন্বিত ফল হিসেবে অতি অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, সুন্নাহ্, আইন, আরবি ভাষা, গণিত ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শী হয়ে উঠেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ﵀-এর পর তিনি ইরাক অঞ্চলে ইসলামি আইনশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। বিশ বছর বয়সে কুফার মাসজিদে পাঠদান শুরু করেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে থাকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফিয়ি, 'কিতাবুল আমওয়াল'-প্রণেতা আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ও সিসিলি-বিজেতা আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀।

ইবরাহীম হারবি বলেন, 'আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀-কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কোথায় পেয়েছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের বইগুলোতে।" '

তিনি এত উচ্চমানের ভাষাবিদ ছিলেন যে, তাঁর ব্যবহৃত বাক্যকে ব্যাকরণের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর গ্রন্থাবলিতে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এসব হাদীস বিশুদ্ধ হাদীস-গ্রন্থাবলিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে—কখনও তা হুবহু শব্দে শব্দে, কখনও কাছাকাছি শব্দ-সমৃদ্ধ, আবার কখনও কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: *আল-জামিউস সগীর, আল-জামিউল কাবীর, আস-সিয়ারুস সগীর, আস-সিয়ারুল কাবীর, আয-যিয়াদাত* ও *আল-মাবসূত* বা *কিতাবুল আস্‌ল ফিল ফুরূ'*। পরিভাষাগত দিক দিয়ে এসব গ্রন্থকে একত্রে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' নামে অভিহিত করা হয়। এসবের বাইরেও তিনি রচনা করেছেন: *আল-মাখারিজ ফিল হিয়াল, কিতাবুল আসার, আল-হুজ্জাহ্ আলা আহলিল মাদীনাহ্, কিতাবুল কাস্‌ব* (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই অনুবাদ) ও *মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক।*

যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে তাঁর লেখা *'আস-সিয়ারুস সগীর'* ও *'আস-সিয়ারুল কাবীর'* গ্রন্থ-দুটি আন্তর্জাতিক আইনের অনবদ্য দলিল। গ্রন্থ-দুটির জন্য জার্মানির আইনজ্ঞগণ তাঁকে পাশ্চাত্য-আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো

[১] মনে রাখতে হবে, এটি ওই যুগের কথা, যখন ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা ছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থাবলি সংকলনের কাজ শুরুই হয়নি।

গ্রোসিয়াসের (Hugo Grotius) সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে যে—বিষয়-বৈচিত্র্য, বর্ণনার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির আসঞ্জনশীলতা (coherence) ও মানবিক সমাধানের বিচারে ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর গ্রন্থ-দুটি হুগো গ্রোসিয়াসের Mare Liberum ও De Jure Belli ac Pacis-এর চেয়ে অনেক উন্নততর।

হারূনুর রশীদের শাসনামলে তিনি বেশ কয়েক বছর রাক্কা'র বিচারক পদেও দায়িত্ব পালন করেন।

৫৮ বছর বয়সে তিনি রাই শহরে ১৮৯ হিজরিতে (খ্রি. ৮০৫) ইন্তেকাল করেন। একই দিন একই স্থানে ইন্তেকাল করেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইমাম কিসাঈ। তৎকালীন শাসক হারূনুর রশীদ আফসোস করে বলেছিলেন, 'রাই শহরে আইন ও ভাষাতত্ত্ব পাশাপাশি দাফন করে এলাম!'

---

[১] দেখুন: Hans Kruse, Die Begründung der islamischen Völkerrechtslehre: Muhammad aš-Šaibānī–„Hugo Grotius der Moslimen", Saeculum, Volume 5, Issue JG (1954-12), pp. 221-242। অনলাইনে স্ক্যান্ড কপির জন্য দেখুন: https://www.degruyter.com/view/j/saeculum.1954.5.issue-jg/saeculum.1954.5.jg.221/saeculum.1954.5.jg.221.xml.